হিন্দুধর্ম ঃ ঔদার্য, নিষ্ঠা ও উন্মাদনা

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের কোন সংবিধান বা আইনসম্মত সন্তোষজনক লক্ষণ নেই। হিন্দু ম্যারেজ ও সক্সেশন অ্যাকট্-এ হিন্দুর একটা লক্ষণ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষণটি মোটামুটি নেতিবাচক। বলা হয়েছে যে যাঁরা মুসলমান নন, খ্রীষ্টান অথবা ইহুদি নন, যাঁরা পারসিক ধর্মভূক্ত নন, —তারাই হিন্দু। এর মধ্যে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধদের উল্লেখ করা হয়নি, তাতে আইন কর্তাদের অদূরর্শিতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয় যে আধুনিক জন-পরিসংখ্যান বা সেন্সারের সময় সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়— হিন্দু তিনিই যিনি মুসলমন - খ্রীষ্টান - ইহুদি পার্শী নন এবং যিনি শিখ্ - জৈন-বৌদ্ধ নন। এর ধরণের লক্ষণ নেতিবাচক হলেও কাজ চালানোর পক্ষে প্রশস্ত। আইন - কর্তাদের উপরোক্ত অচেতন বিস্মৃতির গূঢ় কারণ আছে। আজ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকের ধারণা এমন কি দৃঢ়বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে যে শিখ্, বৌদ্ধ ও জৈন এঁরা বৃহত্তর হিন্দুসমাজেরই অংশ। এইসব হিন্দুদের প্রশ্ন করলে একটা উত্তরই পাওয়া যায়— ইংরেজিতে একটা শব্দ ব্যবহার করে এঁরা বলে থাকেন— ওরা হচ্ছে হিন্দুধর্মের ''অফ্শুট্'' অর্থাৎ প্রগাছা। ''প্রগাছা'' বলার মধ্যে কিন্তু 'প্রশাখা'র মর্যাদাটুকুও নেই — এটি একান্তভাবে অবজ্ঞাসূচক। যুক্তি দিয়ে এ ধারণা ভুল বলে প্রতিবাদ করলেও অনেক শিক্ষিত হিন্দুরা ও মত পাল্টাতে চান না। পুরানো আইন - কর্তাদের তাহলে শিখ - বৈদ্ধ - জৈন ধর্ম থেকে হিন্দুদের পৃথক করতে ভুলে যাওয়া কোন আপাতজনিত বা অ্যাক্সিডেন্টাল্ ঘটনা নয়। এ এক অপরূপ ঔদার্যময় অবহেলা।

ভারতবর্ষে প্রায় শতকরা ৮০ অথবা ৮৩ ভাগ হিন্দু। শিখ্-জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগুলির উদ্ভব হযেছে ভারতবর্ষের মাটিতেই। কিন্তু এগুলো স্বতন্ত্র ধর্মমত; তথাকথিত বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বা হিন্দুধর্মের অংশমাত্র নয়। 'বৃহত্তর' কথাটির মধ্যেও যেন অভিসন্ধির ইঙ্গিত আছে। যেন হিন্দুসমাজরূপ সুপ্রাচীন অজগরটি 'বৃহত্তর মুখব্যাদান' করে অন্য ছোটো ছোটো ধর্মগুলিকে গ্রাস অথবা আত্মসাৎ করতে চাইছে। বলা হয় যে আত্মসাৎ অথবা আত্মীয়করণ হিন্দুধর্মের ঔদার্য মাত্র। পৃথক করে দূরে রাখা হচ্ছে না, কাছে আনা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু অহিন্দুদের কাছে হিন্দুদের ওই ঔদার্যের প্রেমচুম্বন মৃত্যুচুম্বনের নামান্তর মাত্র হতে পারে, অন্তত তা ভেবে দেখা দরকার।

হিন্দু কাকে বলে— এ প্রশ্নের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দেওয়া আজ প্রায় দু-তিন হাজার বছরেও যখন সম্ভব হয়নি তখন আজই তার সমাধান হবে এ আশা করা বৃথা। যথার্থ লক্ষণ নির্বাচন না করে অনেকে 'আর্য ধর্ম' 'সনাতন ধর্ম' 'বৈদিক ধর্ম' ইত্যাদি কয়েকটা শব্দের উল্লেখ করে ভাবেন যে কাকে হিন্দু বলে তার উত্তর দেওয়া হয়ে গেল হয়ত দর্শনসম্মত লক্ষণ নির্বাচনের প্রায়োজনও নেই। কে হিন্দু তার উত্তরে একটা নেতিবাচর লক্ষণের উল্লেখ করে এসেছি। যারা হিন্দু নয় অথবা ভারতবাসী, তাদের বাদ দিলে যা বাকী থাকবে তাদের হিন্দু বলে অভিহিত করতে অন্তত দেশের আইন বাধা দেবে না। কাদের বাদ দিতে হবে? শুধু খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং পারসীক নয়— বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ এদেরও বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের লক্ষণ পরিধি নির্ণয় করতে হবে। লক্ষণটিকে ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী অতিব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত করা যায় সহজে। কিন্তু এই 'নেতিবাচক' লক্ষণ ছাড়া 'ইতিবাচক' অর্থাৎ পজিটিভ কোন লক্ষণ দেওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে সিন্দু নদের নাম থেকে 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া' এই নামের উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই তখন ভারতবর্ষের সকল লোকদেরই হিন্দু বলা হত। অতীত যুগে বিদেশীরা— যাঁরা 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ করতেন তাঁরা—সাধারণ হিন্দু ধর্ম থেকে হয়ত ভারতবর্ষের অন্যান্য উপজাতিদের ধর্মকে পৃথক বলে ভাবতে পারতেন না, কারণ উপজাতিদের ধর্ম সম্পর্কে তখন জ্ঞানও সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ভারতবর্ষে নানাধর্মের সমাবেশ যখন ঘটেছে, যখন পৃথিবীর প্রায় সব প্রধান ধর্মগুলির প্রতিনিধি এখানে বর্তমান —তখন 'হিন্দু' বলতে সমগ্র ভারতবাসীকে না বুঝিয়ে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ধর্মগুলির মধ্যে যাঁরা পড়েন তাঁদের বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের বোঝান চলে। এর মধ্যেও দুটি কথা বলা দরকার।

প্রাচীনকাল থেকেই ভাবতবর্ষে বহু উপজাতি ছিল, এখনও আছে। তাদের অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র 'ধর্ম' ছিল কিন্তু দেখা গেছে যে তারা কোন কোন জায়গায় ক্রমশ হিন্দুধর্মভুক্ত হয়ে পড়েছে— অর্থাৎ তাদের নানা উপজাতিসুলভ ধর্মীয় ক্রিয়া - কলাপের উপর হিন্দুত্বের প্রলেপ পড়েছে। তাদের সব সময় ধর্মান্তরীকরণের প্রয়োজন হয়নি। আবার অনেক জায়গায় নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও মর্যাদালাভের জন্য তারা হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেছে। কখনও বা হিন্দুধর্ম অজ্ঞাতসারে তাদের প্রভাবিত করেছে কখনও বা তারাই হিন্দুধর্মের দিকে জাতসারে এগিয়ে এসেছে। এরকম বোধহয় পৃথিবীর অনেক দেশেই হয়েছে— এর নানা সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণ আছে। সে সবের অলোচনা এখানে করার অবকাশ নেই। তবে বলা যায় যে — এরা হিন্দুধর্মের প্রশাখা, শাখানদী অথবা ''প্রগাছা'' (যাকে ''অফশূট'' বলা হয়) নয়, এরা অনেকটা উপনদীর মত। এরা এসে হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশেছে। এদের হিন্দুত্বকরণও হয়েছে আবার এরা হিন্দুবরণও করেছে।

দ্বিতীয়কথা— এই তথাকথিত শাখানদীদের সম্পর্কে। ''প্রগাছা'' শব্দটিতে আপত্তির কথা আগেই জানিয়েছি। কাজেই বলা যায়, এরা প্রশাখা অথবা শাখানদী কিনা সে কথা বিবেচ্য। সরকারী (১৯৫৬ ম্যারেজ অ্যাকট্) আইনে যে চারটি ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা ''বিদেশী'' ধর্ম। অর্থাৎ এদের উদ্ভব ভাবতবর্ষের বাইরে। আমরা জানি শিখ্ বৌদ্ধ জৈন—এদের জন্ম ভারতবর্ষের মাটিতে। তাই এক হিসাবে এরা 'বিদ্রোহী' ধর্ম— খ্রীষ্টধর্ম যে হিসাবে ইহুদিধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়েও বিদ্রোহী ধর্ম। কিন্তু এই ধর্মগুলিকে হিন্দুধর্মের শাখানদী বললে সত্যের অপলাপ হয়। (ধর্মের সঙ্গে মহীরুহের তুলনার থেকে স্রোতস্বতী নদীর তুলনাই আমার কাছে এখানে বেশী গ্রাহ্য মনে হয় তাই 'শাখানদী'র মাধ্যমেই আলোচনায় অগ্রসর হব।) খৃষ্টধর্ম ইহুদিধর্মের

অফ্‌শূট বা শাখানদী? কোন খ্রীষ্টানই আজ একথা ভাল মনে মেনে নিতে পারবেন না। শাখানদী যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র জলধারায় বাহিত হয়ে নতুন প্রাণ পায় তখন সে আরেকটি নদী, সে স্বতন্ত্র। বিচ্ছিন্ন না হলেও আমরা জানি গঙ্গা আর পদ্মা এক নয়। কাজেই শিখ্-বৌদ্ধ-জৈন এদের শাখানদী বলা যায় না, হিন্দুধর্মের সঙ্গে এদের যতই মিল থাকুক না কেন। উৎপত্তির ইতিহাসে যোগসূত্র ছিল বলে মুসলমান ইহুদি ও খ্রিষ্টান এদের মধ্যেও মিল আছে। তাবলে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে কোনকালেই প্রস্তুত নন। শিখ্-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের হিন্দুধর্মের সঙ্গে উৎপত্তির ইতিহাসে যোগসূত্র ছিল—কাজেই মিলও প্রচুর আছে। কিন্তু সেজন্য এদের হিন্দুধর্মের 'শাখা-নদী' বলা আর রাষ্ট্রক্ষমতা মূলত হিন্দুদেরই হাতে বলে তার বড়াই করা একই কথা। শরৎচন্দ্রের ''মহেশ'' গল্পে তর্কালঙ্কার না কে যেন এভাবেই শাসিয়েছিলেন গরীব চাষী মুসলমান গফুরকে — ''ব্রাহ্মণ জমিদার, তোর সে খেয়াল আছে?''

যাঁরা 'শাখানদী' —মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের আরও গূঢ় বক্তব্য থাকতে পারে। হয়ত তাঁরা 'হিন্দু' ও 'ইন্ডিয়া'-এর মধ্যে উৎপত্তিগত সংযোগ আছে বলে আধুনিককালেও সেই সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকুক বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এই চান। মাঝে মাঝে অনেকে বলে থাকেন যে ভারতবর্ষ হিন্দুদের দেশ কাজেই ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হোক এই পন্থা অনুসরণ যুক্তিযুক্ত নয়। সাধারণভাবে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথককরণ যদিও আধুনকিতার অঙ্গ তবুও প্রতিদেশেই প্রায়শ একটি ধর্মই সংখ্যাগুরুর ধর্ম হয়ে থাকে এবং তার আধিপত্য অনস্বীকার্য। এছাড়াও এরা বলতে পারেন— যদি ইস্‌লাম রাষ্ট্র, ইহুদি রাষ্ট্র প্রভৃতি হতে পারে তবে হিন্দুরাষ্ট্রই বা হবে না কেন? এদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট এবং যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ'রা বোধহয় বাগ্র। আজকের ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতে এ'রা যেন নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয় আর তার সঙ্গে সংখ্যালঘুধর্মের কিছু অধিকার দেওয়া হয় তবে হানাহানির পূর্ণ অবসান না হোক সংঘর্ষ কিছুটা কমে আসবে। এদের এ যুক্তি ভ্রান্ত। আর এদের পন্থা অনুসরণ করলে বিভেদ ও মারামারি যে আরও বেড়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদের মতবাদের গোড়ায় গলদ।

হিন্দুরাষ্ট্র কাকে বলে? প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে জানতে হবে হিন্দু কাকে বলে— আমরা দেখেছি তার উত্তর সুকঠিন। এ পথে অনেক অপ্রতিবিধেয় সমস্যা। প্রথমত হিন্দুধর্মের একটা সর্ববাদিসম্মত 'ইতিবাচক' লক্ষণ নির্ধারণ করতে হবে। হিন্দু রাষ্ট্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে গেলে হিন্দুদের 'নেতিবাচক' লক্ষণে চলবে না। বলতে হবে হিন্দুত্ব কী, কে হিন্দু নয় শুধুমাত্র একথা বললে চলবে না। এই ইতিবাচক লক্ষণ নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে কাকে হিন্দু বলব? যিনি নিয়মিত গীতা পাঠ করেন? না যিনি নিয়মিত পিটস্‌বার্গের ''এস ভি'' মন্দিরে যান? না যিনি: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সৌধমালা সজ্জিত নগরীর পথে পথে হাত তুলে নেচে নেচে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন? না যিনি মন্দিরে নিয়মিত অর্থদান এবং পক্ষান্তরে পরের সর্বনাশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন? না যিনি প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করেন? বৈচিত্র্যের উদাহরণ আরও বাড়ানো যায় কিন্তু তার দরকার নেই। অনেকে শুধু নিজেদের হিন্দু বলে মনে করেন কিন্তু কোন ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করেন না। অনেকে শুধু অদ্বৈত বেদান্তের চর্চা করেন। অনেকে আবার বলেন — সর্বদা সৎপথে থাকার চেষ্টা করাই মূল কথা— হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক কোন বাহ্যিক ধর্মাচরণের প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে 'আর্য' বা হিন্দুসমাজে'র শ্রীবৃদ্ধির জন্য অন্য ধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরীকরণে বিশ্বাস করেন। এইসব প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সামান্য লক্ষণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। 'নেতিবাচক' লক্ষণেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এছাড়াও নানা বিপদ আছে। একটা হিন্দুরাষ্ট্র হলে তাকে নির্ভর করতে হবে একটা ধর্মানুমোদিত 'ধর্মশাস্ত্রে'র উপর যা থেকে বিবিধ রাষ্ট্রীয় আইনকানুন বিচারবিধি গৃহীত হবে। এদিকেও পরস্পরবিরোধী এবং পরস্পরবিলোপী বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। মনু যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাচীন বিধিনিষেধের দিকে আজ ফিরে যাওয়া যায় না। কেউই প্রাচীন জগতে ফিরতে ঠিক পারে না। আধুনিক মঞ্চে শুধু প্রাচীন ভূমিকায় অভিনয় মাত্র করা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ও স্থানীয় রীতিনীতি দেশাচার ও লোকাচার এতই বিভিন্নমুখী ও বিসদৃশ যে তার ওপর ভিত্তি করে কোন সর্বভারতীয় আইনকানুন বিচার - ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে পুরানো জাতি ও বর্ণভেদ প্রথাকে মেনে নিয়ে অথবা সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে সর্বভারতীয় গণতন্ত্র চালান অসম্ভব। কারণ গণতন্ত্রের সঙ্গে 'যাজ্ঞবল্ক্যতন্ত্রে'র মিলন ঘটান অসম্ভব। গণতন্ত্রের নলবদ্ধ আদর্শ—সর্বমানুষের সমান অধিকার, সকলের ভোটাধিকার এবং আইনের চোখে সকলের সাম্য। প্রাচীন সমাজে সাম্যের স্বীকৃতিও ছিল না।

বলা যায় যে গণতন্ত্রকে এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপায়িত করার যে সাধনপ্রচেষ্টা তা এদিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ই কৃতিত্বে সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্র - সংবিধানের কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ছিলেন হিন্দু তাঁদের দুর্বুদ্ধি হলে তাঁরা অন্যরকম ভাবতে পারতেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনির্মাণে সম্মতি দিয়ে তাঁরা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে এই শুভবুদ্ধির কথা মেনে নেওয়া গেল। অন্যরকম হতে পারত, তা হয়নি। যে কারণেই হোক— এজন্য ভাগ্যকে শতবার ধন্যবাদ দিতে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কেও কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ফরাসীদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান রচিত হয়েছিল। আমাদের জাতীয় নেতারা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আজ বদলে যাচ্ছে। আগে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা— যুক্তরাষ্ট্রে বা ফরাসি দেশে এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয়েচিল। ধর্মসংস্থান বা চার্চকে রাষ্ট্রক্ষমতার পীঠস্থান থেকে সরাতে হবে, রাষ্ট্র ধর্মীয় ব্যাপার থেকে দূরে থাকবে এবং ধর্মযাজকেরা রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা - সূত্রটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন কিন্তু ঠিক সেই অর্থ নেই। ধর্মনিরপেক্ষতা এখন নতুন অর্থে একদিক থেকে বহুধর্মের স্বীকৃতি ও তাদের সমান মর্যাদা দান করে। অর্থ পরিবর্তনের এই মধ্যস্রোতের মধ্যে ভারতবর্ষ অবস্থিত। ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার এই বর্তমান

অর্থকে ভারতবর্ষ অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সচেতনভাবেই গ্রহণ করেছে যদিও কার্যত এর প্রয়োগের ক্ষেত্র নানা সমস্যায় কন্টকিত।

বলা যায়যে আগের যুগে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল নেতিমূলক অর্থাৎ ধর্ম-ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার পৃথক্করণ, আধুনিককালে সজ্ঞানে ধর্মবাহুল্যকে স্বীকৃতি ও মর্যাদাদান ইতিমূলক অর্থাৎ পজিটিভ্। আধুনিক কালের সমস্যা অন্য ধরণের। শুধু ভারতবর্ষেই নয় অন্যান্য রাষ্ট্রেও সংখ্যালঘুর ধর্মকে বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মর্যাদা দানের প্রশ্ন উঠেছে। এর জন্য আন্দোলন ও হানাহানির অন্ত নেই। এমন কি খৃষ্টান দেশেও যেখানে সর্বমানুষের সমান অধিকার বৈধভাবে স্বীকৃত সেখানে অবৈধ হিংসা অথবা অদৃশ্য বৈধ হিংসা সাড়ম্বরে বিরাজমান। যতই আমরা মানবতার জয়গান করি না কেন ''মানুষ মানে নিজ সমাজের নিজ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত একজন সদস্য'' —মানুষের এই উপজাতিসুলভ লক্ষণ এখনও অদৃশ্যভাবে তথাকথিত সভ্যজগতের মনকে প্রভাবিত করে চলেছে।

ধর্ম নিয়ে যে উন্মত্ততা বর্তমান রাজনীতির ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তা খুবই ব্যাপক। বিভিন্ন দেশে তার প্রসার ও বেদনাময় গভীরতার কথা আজ কেউ অস্বীকার করবেন না। ধর্মীয় বিভেদচেতনার ভীতিপ্রদ পুনরুত্থান শুধু পশ্চিম এশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর নানা অংশে এটি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন যুগেও হানাহানি ছিল প্রচুর। ইতিহাসের ''স্বর্ণযুগ'' অনেকটা আদর্শবাদী ঐতিহাসিকদের কল্পবিলাস মাত্র। কিন্তু সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই উন্মত্ততা কমে আসবে—এরকম আশা অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি— বর্তমানে ধর্মীয় বিরোধ একটা জাগতিক সমস্যা— তা ক্রমশ গুরতর আকার ধারণ করেছে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এই সমস্যাটি আরেকটি গভীরতর সমস্যার একটি অংশ মাত্র, অর্থাৎ নিমজ্জিত তুষারশৈলের দৃশ্যমান শৃঙ্গের ভগ্নাংশস্বরূপ। সাধারণভাবে এই বৃহত্তর সমস্যার নাম দেওয়া হয় সংখ্যালঘু সমস্যা। পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই আজ জনসংখ্যা নিতান্তভাবে এক বর্ণের এক ধর্মের বা এক সংস্কৃতির নয়। ধর্ম - বৈচিত্র্য বর্ণবাহুল্য ও সংস্কৃতিবহুত্ব আজ অনিবার্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে বিভেদ নিয়ে নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বা শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে নিজ বর্ণ বা জাতি নিয়ে তার উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে বড়াই করা শুধু অজ্ঞতার পরিচায়কই নয় পরম অধর্মেরই অগ্রদূত। ধর্ম বর্ণ ও সংস্কৃতিবাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আজ রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বিচারবিধি প্রভৃতি সবই বুঝতে হবে। বহুত্বের ভিত্তিভূমিতেই রাষ্ট্রসমস্যা ও সমাজসমস্যাকে সমাধান করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার একটি প্রায় নলবদ্ধ অর্থ—এর থেকেই আমাদের কর্মপথ বেছে নেওয়া উচিত।

ধর্মনিরপেক্ষতা যেমন আধুনিক মানসিকতার অবদান তেমন ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে বিপজ্জনক সংমিশ্রনীকরণও আধুনিকতম অবদান। আমাদের গণতন্ত্রের (অথবা অন্য স্বৈরতন্ত্রের) মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক নেতা তাঁরা এই সংমিশ্রনীকরণে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। কারণ তাঁদের কাছে ক্ষমতালাভই একমাত্র লক্ষ্য অর্থাৎ ক্ষমতার যোগক্ষেমেই একমাত্র ধর্ম। ভেদকে বজায় রেখে ভেদবুদ্ধি দূর করে ঐক্যবুদ্ধি আনলে তবেই সমাজের মঙ্গল এবং সমাজের মঙ্গলেই ব্যক্তির প্রাতিস্বিক স্থায়ী মঙ্গল তা বুঝতে পারা এবং ক্ষমতালাভ করে সেই স্থায়ী মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচায়ক। নেতার কাছে ক্ষমতার যোগক্ষেমের প্রয়োজন এই জন্যই । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আধুনিক রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শুধু ক্ষমতার জন্যই ক্ষমতালোভে প্রয়াসী। যেন তেমন প্রকারেণ ক্ষমতালোভ এবং ক্ষমতাসীন হয়ে থাকা— এই তাঁদের মূখ্য উদ্দেশ্য শুধু নয় একান্ত উদ্দেশ্য। আরও দুঃখের বিষয়, আজকের জগতে বিশেষ করে 'তৃতীয় জগৎ বলে যাদের অভিহিত করা হয় তাদের দেশে রাজনীতি সমাজের অনুপরমাণুতে প্রবেশ করেছে। রাজনীতি ছাড়া সামাজিক জীবের বাঁচার পথই নেই। কাজেই রাজনৈতিক নেতার দায়িত্ব আজ আরও ব্যাপক। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত লোক আজ বিরল।

ধর্ম সাধারণ মানুষের অন্তরের বস্তু। বুদ্ধিজীবী যাঁরা তাঁদের কাছে ধর্ম মূল্যহীন মনে হলেও সাধারণ মানুষ আজও ধর্মের অধীন। সাধারণ মানুষকে নানা আন্দোলন উন্মাদনায় উৎসাহ যোগায় ধর্মবিশ্বাস—ধর্মের জন্য আত্মবলি গৌরবের এবং অনেকের কাছে অবশ্যকর্তব্য। কাজেই ধর্মীয় উন্মাদনায় ইন্ধন যোগালে বহু আধুনিক নেতার ক্ষমতাসীন হয়ে থাকার সুবিধা হয় — কাজেই রাজনীতির মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটান হচ্ছে প্রায় সচেতনভাবেই। এতে বিপদ প্রচুর— তা আজকের দিনে বেশী করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মধ্বজী রাজনৈতিক নেতা বোধহয় ধর্মেরও কিছু বোঝেন না, আর রাজনীতিরও সর্বনাশ করে ছাড়েন। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এদের দান প্রায় অপরিসীম এবং অপ্রতিরোধ্য।

হিন্দুধর্মের কথায় ফিরে যাই। আরবীয় পর্যটক পণ্ডিত আল্‌বেরুনী বহুদিন আগে বলেছিলেন যে, ''হিন্দু ঠিক মুসলমান খৃষ্টান ইহুদিদের মত ধর্ম সম্পর্কে একান্তভাবে সচেতন নয়, কারণ তারা ধর্ম নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক করে বটে কিন্তু ধর্মের জন্য হঠাৎ এক কথায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয়।'' একথা হয়ত আজ সর্বাংশে সত্য নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের অন্তত একটা বিশেষ মনোবৃত্তি বা লক্ষণকে আল্‌বেরুণী দোষ হিসাবে এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছেন — আজকের যুগে বিজ্ঞানলব্ধ সচেতনতা নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে সেটাকে আমরা বলতে পারি— ''ভূষণং নতু দূষণম্''। অর্থাৎ সম্পর্কে মানুষের নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ভাল— কিন্তু আধুনিক ধর্মান্ধতা কোন অংশেই ভাল নয়। ধর্মান্ধতার বশে প্রাণহানি প্রতিবেশীর গলায় ছুরি নিরপরাধ পথযাত্রীকে হত্যা প্রভৃতি পৃথিবীর কোন নীতিধর্মসম্মত হতে পারে না। ধর্মের জন্য অযথা প্রাণহত্যার পরামশ যাঁরা দেন তাঁরা নিতান্ত অধার্মিক।

হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্য অপরিসীম, এর প্রাচীনত্ব এবং এর জীবনশক্তিও আজ পরীক্ষিত সত্য। এই বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার ফলেই মনে হয় হিন্দুধর্মের মধ্যে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ যেন নিহিত আছে। এটা হিন্দুত্ব নিয়ে গৌরব করার জন্য বলছি না।

শুধু আল্ বেরুণীর উক্তিটিকে স্মরণ করতে বলি। এই জন্যই বোধহয় এত সহজে আমাদের হিন্দুপ্রধান সংবিধানকর্তারা নিজেদের অজাতসারে ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন সূত্রকে মেনে নিয়েছিলেন। 'বোধহয়' বলছি এই জন্য যে এসব ঐতিহাসিক ঘটনার কোন সরল কারণ নির্ধারণ করা যায় না। তাই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। যাই হোক সংবিধানকর্তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন সূত্রকে মেনে নিয়েছিলেন। 'বোধহয়' বলছি এই জন্য যে এসব ঐতিহাসিক ঘটনার কোন সরল কারণ নির্ধারণ করা যায় না। তাই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। যাই হোক সংবিধানকর্তারা যদি আজকে এই কারণে আমাদের প্রশংসার পাত্র হন তবে আজ যাঁরা আমাদের মধ্যে ধর্মান্ধতার বীজ বপন করেছেন অথবা প্রাচীন ধর্মোন্মাদনা — যা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন কোন অংশে নিশ্চয়ই সক্রিয় ছিল তাকে— আবার জাগাতে চাইছেন তাঁরা নিতান্ত নিন্দার পাত্র। একে ধর্মনিষ্ঠা বলে যেন কেউ ভুল না করে। নিষ্ঠা ও অন্ধত্ব এক নয়।

অনেকে বলেন — সংখ্যালঘুদের মধ্যে যদি ধর্মের নামে ধর্মোন্মদনা বাড়ান হয়, তাদের মধ্যে যদি ধর্মনিষ্ঠা অথবা ধর্মরক্ষার নামে ধর্মান্ধতার প্রসার হয়, তবে সংখ্যাগুরুদের হিন্দুধর্মই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এক অপ্রয়োজনীয় অপরাধবোধ থেকে হিন্দুরা যদি নিজেদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শনে কুণ্ঠা বোধ করেন তাহলে নাকি হবে নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। হিন্দুদেরও আজ নিজেদের জোরগলায় ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করতে হবে এবং নাকি বেশী জাঁকজমক করে ধর্মাচরণ করতে হবে। হিন্দুধর্মের যদিও একটা কেন্দ্রীভূত সংস্থান নেই তবুও এইভাবে ক্রমশ একটা ক্ষমতাকেন্দ্রকে গঠন করতে হবে। তবেই নাকি হবে হিন্দুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ''ইউনাইটেড্ উই স্ট্যান্ড''। আজকাল মার্কিন দেশে শিখ্ গুরুদ্বার ও মসজিদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মন্দিরেরও ছড়াছড়ি। বহু দেবদেবী (অর্থাৎ শ্বেত বা কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্তি) বায়ু - যানবাহিত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যাচ্ছেন। বিবিসি ও সিসিবি এস্ -এর দূরদর্শনযন্ত্রেও তারকাদের মত এঁদের দেখানো হয়। ইংরেজীতে পরিচয় দিতে গিয়ে যা বলা হয় তার বাংলা তর্জমাও অদ্ভুত শোনায়— ''ভগবান বায়ুরথে আসছেন।'' ফেলিনির ''লা দল্‌সি ভিটা'' চিত্রটির প্রাথমিক 'শট্'টি মনে পড়ে। হেলিকপ্টার এক বিরাট যিশুখৃষ্টের প্রস্তরময় (?) মূর্তি নিয়ে রোম নগরীর দিকে উড়ে যাচ্ছে। একটি মেয়ে বলে উঠল 'ঐ দেখ, যিশু।' ফেলিনির বক্তব্য ছিল নাকি— আমরা ভগবানকে পাথরে পরিণত করেছি। আমাদের রসময়ীতাও শ্বেতপাথরে পরিণত। আর শ্রীবেঙ্কটেশ্বর কৃষ্ণপ্রস্তর ও স্বর্ণমুকুটে। বিদেশের এইসব মন্দিরে বালক বৃদ্ধ নরনারী সকলে আসেন এবং এখানে খৃষ্টান চর্চা-এর অনুকরণে অজ্ঞাতসারে অনেক ক্রিয়াকলাপের অবতারণা হয়। এতে ''বিদেশী'' হিন্দু ছেলেমেয়েরা, যারা মার্কিন দেশে, কানাডায় বা ইংল্যান্ডে জন্মেছে তারা, নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে, জানতে পারে তাদের মূল কোথায় —ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদেশে হিন্দুধর্মচর্চা, তার গতি প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লিখতে গেলে আরেকটি দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করতে হবে। শুনেছি আমার বন্ধুস্থানীয় দুই পণ্ডিত রোমিলা থাপার ও গায়ত্রী স্পিভাক্ এই গবেষণা প্রবন্ধ লিখবেন। স্বদেশে হিন্দুর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে লিখবে বলেই আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা। পুনরুজ্জীবন হয়ত ভাল যদি লক্ষ্য ঠিক থাকে। হিন্দুধর্ম একেবারে ব্যক্তিগত ধর্ম— তা আগেই বলেছি। এ জন্যই বোধহয় সব বৈচিত্রকে সহ্য করে এ ধর্ম এখনও জীবিত আছে— এবং এর প্রাণশক্তি এখনও যথেষ্ট। অন্য ধর্মের মধ্যে ধর্মোন্মাদনা ও ধর্মান্ধতার প্রসার দেখে যাঁরা কপিসুলভ অনুকরণবৃত্তির বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন তাঁদের দেখে মনে মনে পরম শঙ্কাই উপস্থিত হয়। ''যুদ্ধং দেহি'' মনোভাব ক্ষমতার প্রসারক। এই ক্ষমতার খেলাতেই দেখা যাচ্ছে সে পুরানো যুগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা — যাতে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার পুনর্মিলন হতে বাধ্য। তাহলে আমরা আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে যেতে পারব কিনা জানি না কিন্তু নিশ্চয়ভাবে এই মধ্যযুগীয় ভবিষ্যৎকে ডেকে আনব যার ফলে মনুসংহিতার যা যুক্তি—

''সমর্থ হলেও শূদ্রকে বেশী অর্থসঞ্চয় করতে দেওয়া উচিত নয় কারণ তাহলে সে নিজের কর্তব্য অর্থাৎ উচ্চজাতিকে সেবাকরারূপ ধর্ম পরিত্যাগ করবে এবং তাতে হবে সামাজিক অমঙ্গল।'' (মন ১০ম অধ্যায়, শ্লোক ১২৯)

(শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসংচয়ঃ
শূদ্রো হি ধর্মমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে।)

এইসব যুক্তিগুলিকেও এই গণতন্ত্রের যুগে মনে হবে যথার্থ, এবং বরণীয় ও গ্রহণীয়।

অন্তত দুটি বিষয়ে পরম সতর্কতার প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতা যেন ধর্মকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার না করেন। আর 'ধর্মনিষ্ঠার' নামে ধর্মোন্মাদনাকে ডেকে আনলে রুদ্রের ধ্বংসলীলাকেই ডেকে আনা হবে। নেতা হয়ে উঠনে ''আয়াতোলা খালি খালি'' যিনি খালি শিরশ্ছেদে ব্যাপৃত থাকবেন।

সূত্র ঃ 'পুরোগামী'